রাজনারায়ণ বসু।

(তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের অসম্পূর্ণ চিত্র)

তাঁহার এক কন্যা কর্তৃক
প্রকাশিত।

সাগ পেস
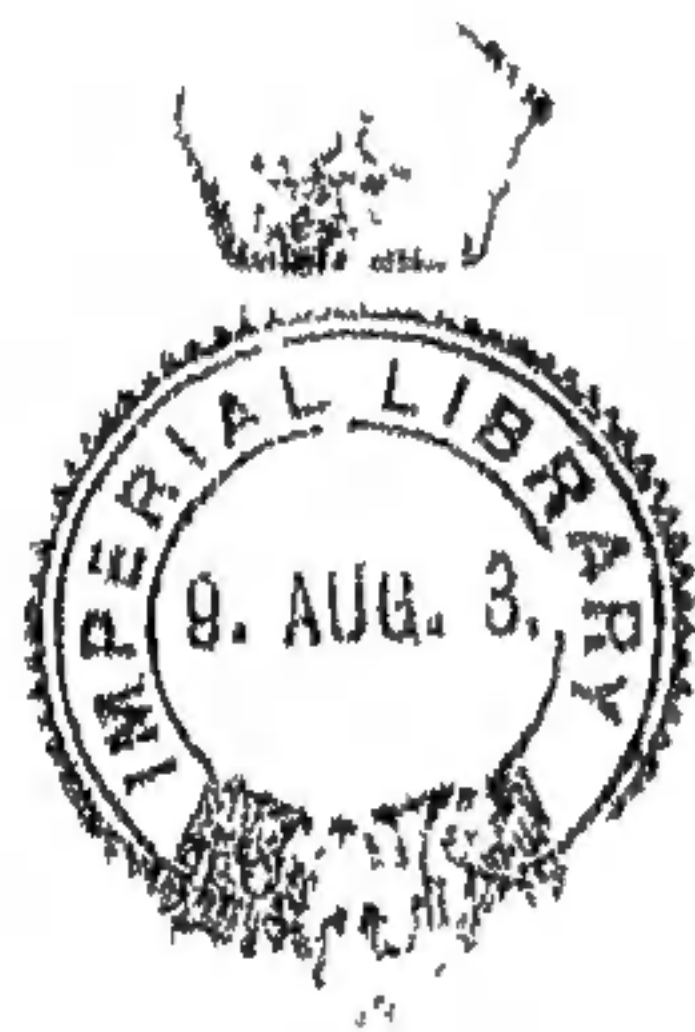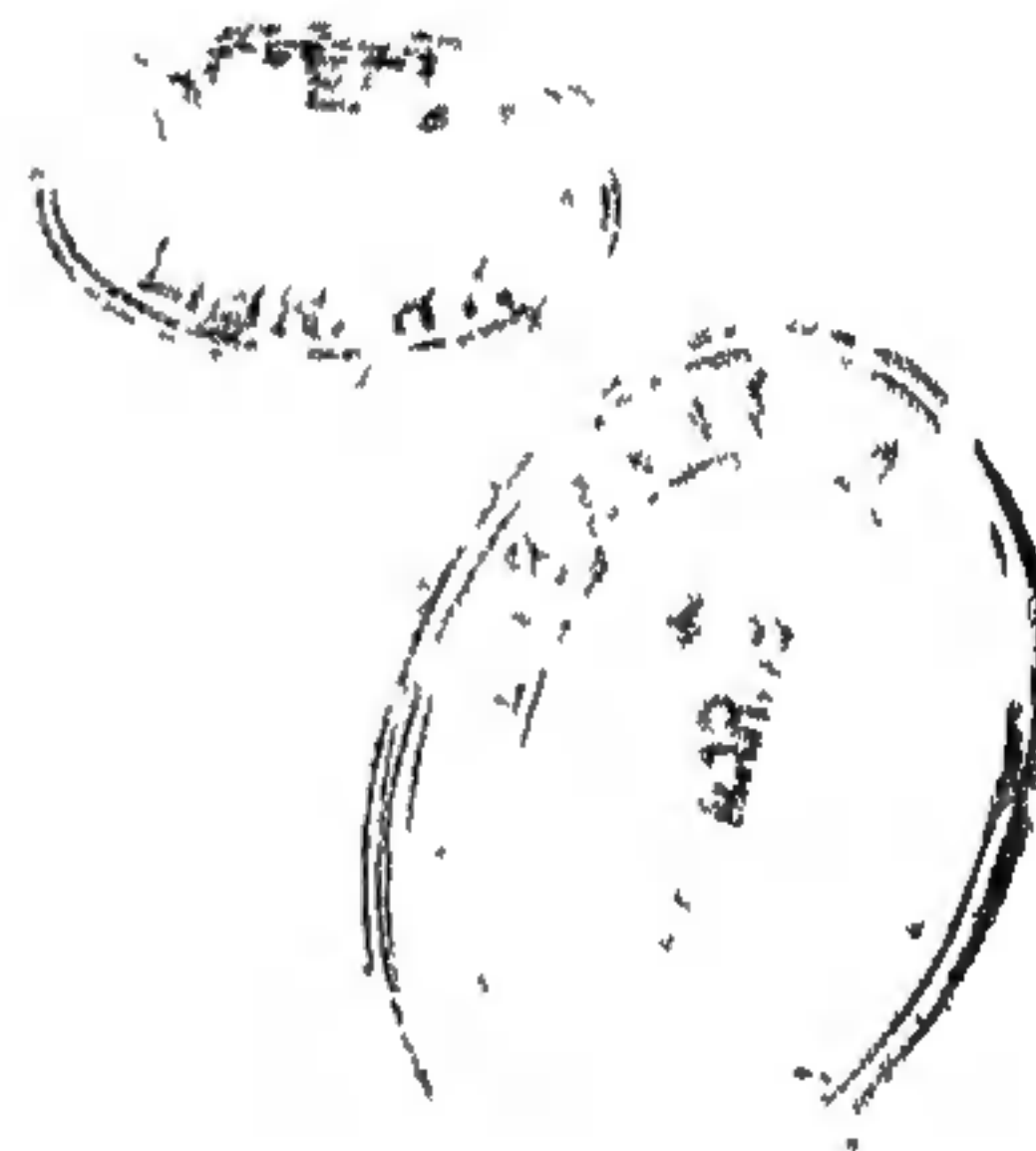
স্বর্গগত

রাজনারায়ণ বসু।

১৭৮৪ শকের ২৩এ ভাদ্র দিবসে (ইং ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬) ২৪শ পরগণার অন্তঃপাতী বোড়াল গ্রামে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্ম হয় তাঁহার যখন ১৯ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন তাঁহার পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজী শিখিয়াছিলেন নন্দকিশোর বসু অতি সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও সরলতার আধার ও অতি ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন নন্দকিশোর বসু যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে বহু উপার্জ্জন হইত। অনেক পরিবার পরিজন, গরিব দুঃখী ও অভ্যাগত লোকের সেবায় তিনি সমস্তই ব্যয় করিতেন যে কর্ম্ম তিনি করিতেন, তাহাতে লোকে উৎকোচ লইত, তাঁহাকেও অনেকে উৎকোচ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, কিন্তু সেই উৎকোচের যুগে তিনি এক পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার এক মাসের বেতন ভিন্ন পরিবারের আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর সময় লোকেরা বলিল, "আপনার অভাবে এই বৃহৎ পরিবারের কি তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজনারায়ণ র বলিলেন, "তোমার এমন পুত্র রহিল ভাবনা কি?" সকলেই একজনকে শঙ্করভাষ্য পড়িতে বলেন এবং ওঁকার যাইতেন, প্রাণত্যাগ করেন।

৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাল্যকালে অধ্যয়নে এত মনোযোগী ছিলেন যে, সম্মুখে নানা আমোদ প্রমোদ হইলেও তিনি চাহিয়া দেখিতেন না। রাস্তায় কোনও তামাসা হইত, তাঁহার মাতা বলিতেন, "রাজনারায়ণ একবার দেখ্না।" "ওসব দেখে কি হবে মা" এই কথা বলিয়া পাঠে যেমন নিযুক্ত ছিলেন, তেমনই থাকিতেন। (যে বয়সে অধিকাংশ ছেলেরা নানা আমোদ প্রমোদে রত থাকে, তিনি সে বয়সে মহা পণ্ডিত হইয়া মহৎ সংকল্পে জগৎক্ষেত্রে বাহির হইয়াছিলেন ১৬ বৎসর বয়সে হিন্দু কালেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করেন)

(সে কালে কলেজে যাঁহারা তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান ছিলেন ইংরেজী ভাষায় তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ও পারসীতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল পিতার মৃত্যুর পরে বৃহৎ পরিবারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল)

বিদ্যালয় পরিত্যাগ কালে তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদ পাইতে পারিতেন কিন্তু বাল্যকাল হইতেই জ্ঞান পিপাসা ও সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছা যেমন প্রবল হইয়াছিল, ধনোপার্জ্জনের ইচ্ছা তেমন প্রবলতা লাভ করিতে পারে নাই সুতরাং ...নি ধনের সেবায় বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ না করিয়া আদি ...মাজে প্রবেশ করিলেন এবং উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ কার্য্যে ...লন অবশেষে শিক্ষার মধ্য দিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে তিনি ...া শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

...াজনারায়ণ বসুর জীবন সৎকাহিনী ও বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। ...র প্রধান কার্য্যক্ষেত্র তিনি মেদিনীপুরের প্রবল উৎ- ...প্রচার করিয়াছেন তাঁহারই আগ্রহে মেদিনীপুরের

ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল দেশের উপকারের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিতেন এবং অনেক কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন তিনি মহা অনুরাগ ও প্রেমের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এখানে মদ্যপান নিবারণের জন্য সুরাপান নিবারণী সভা, বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির জন্য সাহিত্য উৎসাহিনী সভা, শ্রমজীবীদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয়, সাধারণের শিক্ষার উন্নতির জন্য পাঠাগার স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার সমস্ত কার্য্য করিতেন নারীদিগের উন্নতির জন্য তিনি মেদিনীপুরে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শুধু বিদ্যালয় নয়, বাড়ীতেও স্ত্রীলোকের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন

নারীজাতিকে তিনি অতিশয় সম্মান ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। স্ত্রী—স্বাধীনতার বিষয়ে যেমন তাঁহার অনুরাগ ছিল, তেমনি তিনি এ বিষয়ে সংযত ছিলেন তিনি বলিতেন, যখন স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলন হয়, তখন আমাকে একজন প্রাচীন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "বাবা, আগুন লইয়া খেলা টের পাবা" রাজনারায়ণ বাবু নারীজাতির সম্বন্ধে বলিতেন—"ধর্ম্মেতে হৃদয় গঠিত করিয়া নারীজাতিকে ছাড়িয়া দাও, কোন ভয় নাই" তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন কন্যাদের যৌবনকালেই বিবাহ দিয়াছিলেন ইচ্ছানুরূপ বিবাহ তিনি পছন্দ করিতেন, বিবাহ করা ও না করা, তিনি পুত্র কন্যার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেন কখন কখন স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে লইয়া সাহিত্য আলোচনা করিতেন, কখন কখন ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন, পরিবারস্থ সকলকে সাধুদের জীবনচরিত লইয়া, নানাভাবে, সময় সময় উপদেশ দিতেন।

তাঁহার বাটীতে নিয়মিতরূপে সাপ্তাহিক উপাসনা হইত, সকলেই বালক বৃদ্ধ সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইত। কাহারও বাটীতে যাইতেন,

তিনি তাহার কাছে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করিতেন বিশেষ কোনও প্রতিবন্ধকতা না হইলে ইহা বন্ধ করিতেননা পারিবারিক উপাসনার নির্দ্দিষ্ট একটি প্রণালী রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন দেওঘরের বাটী তৈয়ার হইবার পূর্ব্বে যখন কথা হইতেছিল যে, দেওঘরে স্থায়ীভাবে থাকা হবে, তখন তিনি সেই সময় দেওঘরের উত্তরাংশে একটি পুষ্করিণীর ধারে কয়েকখানা চালা ঘর সংযুক্ত একটি ভগ্ন জীর্ণ গৃহ দেখিয়া তাহা পছন্দ করিয়াছিলেন এবং কিনিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন—পরে অনেক দিন পর যখন বড় বাড়ী হইল, তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন—"একি হইল, আমি চাই চালাঘর, হল বড় বাড়ী।" যখন উক্ত বাটীতে প্রবেশ করা হয়—তিনি পরিবারস্থ সকলকে বাহিরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইতে বলিয়া, একটি প্রার্থনা করিলেন। তাহার কিয়দংশ এই—"হে পরমেশ্বর এই গৃহে যদি আমরা সম্পদে উন্নীত হই, তবে তাহার মোহমদে যেন তোমাকে না ভুলি, বরং তুমি তাহার প্রতিষ্ঠাতা এই স্মরণ করিয়া, কৃতজ্ঞচিত্তে সুখ সৌভাগ্য গ্রহণ করি। আর যদি বিপদে ও দুঃখে পতিত হই, শোকের দারুণ যন্ত্রণায় হৃদয়যন্ত্র নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তথাপি তোমার মঙ্গল বিধানে অবিশ্বাসী যেন না হই তাহাও মঙ্গলজনক ভাবিয়া বিশ্বাসী থাকি এবং তাহার ভীষণ যাতনায় ধর্ম্মভ্রষ্ট না হই, এই পরিবারে যেন কখন বিরোধ ও কলহ প্রবেশ না করে,' ইত্যাদি।

একবার কোন মহিলা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "খুকী ও বৎসরের আজ প্রায় এক বৎসর খুকী আমার কাছ ছাড়া, কিন্তু আমি যখন থেকে আসিলাম, খুকী আমাকে দেখিয়াই—"মা এসেছ আমায় নাও" বলিয়া আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—আশ্চর্য্য যে আমাকে কেমন করিয়া চিনিল—একটুও ভুলে ...র লিখিলেন, "আহা হা, আমরা পরলোকে গিয়া

জগজ্জননীর কোলে ঠিক অমনি করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িব, সে কি সুন্দর অবস্থা ”

আর একবার কোন মহিলা তাঁহার শিশুকন্যা লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁহার শিশুকন্যা ' মা কোলে উঠিব'' বলিয়া আব্দার করিতে লাগিল, নানা কথা চলিতেছিল, তিনি হঠাৎ স্বর্গীয় পবিত্র হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আহা আহা সে বিশ্বজননীর কাছে কবে আমরা আব্দার করিব, মা কোলে উঠিব।"

একবার তিনি বৈদ্যনাথের সহরের দিকে বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ একজন মহাদেব দর্শনপ্রয়াসী যাত্রী আসিয়া তাঁহার পদযুগলে পড়িয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। তিনি অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন সে যাত্রী কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না সে বলিল, আমি মহাদেব দর্শন করিতে আসিয়াছি, এই তো সাক্ষাৎ মহাদেবের দর্শন পাইলাম, আর কি হবে সে পাথরের শিব দেখিয়া, আপনি সাক্ষাৎ মহাদেবের মূর্ত্তিধারণ করিয়া আমাকে দেখা দিয়াছেন।" তিনি অতিশয় সঙ্কুচিতচিত্তে প্রেমের সহিত কত বুঝাইলেন, কত প্রমাণ দেখাইলেন। যতই বুঝান, যাত্রী ততই মুগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহার দেবভাব দেখিয়া তাহাকে দেবতা বলিয়া ভ্রম করিল। শেষে সেদিন অনেক কষ্টে তাঁহার সঙ্গ হইতে যাত্রীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

দেওঘরে যত লোক যাইত, প্রায় সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইত। কত হিন্দু, কত খ্রীষ্টান, কত সন্ন্যাসী, আরও কত প্রকৃতির লোক যাইত। সকলকে তিনি কেমন উদারতার সহিত গ্রহণ করিত রোগী, শোকী, ধনী, দরিদ্র, শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, সকলকে তিনি সমান চক্ষে সমান ভাবে দেখিতেন, তিনি বলিতেন আহা, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান আদরের সামগ্রী। যত শিক্ষিত হিন্দুরা দেওঘরে যাইতেন,

সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেন। তাঁহারা বলিতেন, দুটী মহাদেব আমরা দর্শন করিতে আসিয়াছি একটী অচল বৈদ্যনাথ, আর একটী সচল বৈদ্যনাথ একবার তাঁহার কয়েকটী বন্ধু তাঁহাকে দর্শন করিতে দেওঘরে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী যুবক ছিলেন, তাঁহার শরীরে গলিত কুষ্ঠব্যাধি ছিল রাজনারায়ণ বাবু অন্য সকল বন্ধুকে দেখিয়া যেমন আনন্দে প্রেমালিঙ্গন করিলেন, উক্ত কুষ্ঠরোগীকেও সেই ভাবে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। উপস্থিত দর্শকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

তাঁহার হৃদয় খানি অতি মধুর প্রেম ও স্নেহে গঠিত ছিল তাঁহার বিশ্বপ্রেমের হৃদয়খানি কতদূর মহৎ ও উদার ছিল, বর্ণনা করা যায় না পরিবারস্থ সকলকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন দাস দাসীদের মঙ্গলকামনা করিতেন, কন্যাদের খুব ভাল বাসিতেন পুত্র কন্যাদের সহিত তিনি সাহিত্য ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন তাঁহার এক কন্যার সহিত নিয়মিতরূপে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন উক্ত কন্যার বয়স হইয়াছিল, তবুও দেখা হলেই তাহার দাড়ীতে ধরিয়া আদর করিতেন। পুত্র কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও তিনি তাহাদিগকে সেই শিশুর মতন দেখিতেন। ইদানীং পক্ষাঘাতে যখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, উক্ত কন্যা যখন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইত, তিনি তাঁহাকে কাছে বসাইতেন এবং মাথায় গায়ে হাত বুলাইতেন ও আশীর্ব্বাদ করিতেন ভাল দেখিতে পাইতেন না এজন্য সম্মুখে দাঁড় করাইয়া অনেকক্ষণ দেখিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহাকে কাছে বসাইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। পরে কন্যা যেদিন বিদায় লইত, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং বার বার বলিতেন ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। যখন তাঁহার এক কন্যা বিবাহের পরে চলিয়া আসে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন "মা, অধীর হইও না। এ পৃথিবী ছাড়াছাড়ির

পৃথিবী, প্রধান ছাড়াছাড়ি মৃত্যুর সময়। অতএব ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণ কর ” তাঁহার হৃদয়ের মধুময় স্নেহের কথা কি বলিব, ক্ষুদ্র বালক বালিকারা যদি তাঁহাকে প্রণাম করিত, তিনি সম্মানের সহিত প্রতি নমস্কার করিতেন। তাহারা সামান্য কিছু উপহার দিলে আহ্লাদের সহিত লইতেন।

গত বৈশাখ মাসে একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, দেখ আমি কয়েকদিন হইল একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন পুরীতে গিয়াছি সম্মুখে মস্ত এক পর্ব্বত তাহার নীচেই সমুদ্র, সেই সমুদ্রের কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, "আমার যে জগৎ মাতা তিনি কি এখানে? সেই স্থলে দাঁড়াইয়া আমি আমার জগৎ-মাতা কোথায় বলিয়া মা মা করিয়া কাঁদিতেছি ”— স্বপ্নের কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। স্বপ্ন ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে, তাঁহার মুখ কি যে অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাহা কি বলিব.

তাঁহার তৃতীয়া কন্যা অল্প বয়সে একটী পুত্র ও একটী কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন—যখন তৃতীয় জামাতার মৃত্যু হয়, সকলে কাঁদিতেছিল, তিনি বলিলেন, "যাঁর ধন তিনি লইয়াছেন, যতক্ষণ আমাদের কাছে রাখিবার ইচ্ছা ছিল রাখিয়াছিলেন, এ যে ছাড়াছাড়ির পৃথিবী ” উক্ত বিধবা কন্যার একমাত্র পুত্রকে শিশুকাল হইতে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন বালকটি চরিত্রে, সাধুতায়, ধর্ম্মভাবে বাল্যকাল হইতে নানা গুণে এমন বিভূষিত হইয়াছিল যে, দেওঘরবাসীরা তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সে দেওঘর স্কুলের সর্ব্ব প্রথম ছাত্র ছিল উক্ত বালকটিকে তিনি সমধিক স্নেহ করিতেন—এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। একদিন বাহিরের ঘরে অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছেন, সেই সময় তাঁহার কি দরকার হইয়াছে, তিনি উচ্চৈঃ-

স্বরে ডাকিলেন, "অবিনাশ দাদা এখানে এস" উপস্থিত ভদ্রলোকেরা ভাবিলেন, ইনি এত বৃদ্ধ ইহাঁর দাদা কে ? পরে যখন দেখিলেন একটী সুন্দর বালক মৃদুহাস্যে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সকলে হাসিয়া বলিলেন, "ইনি আপনার দাদা" তিনি বলিলেন "উনি আমার বিজ্ঞ দাদা উহাঁকে আমি বড়ই স্নেহ করি।" যখন তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ হয়, তাহার এক বৎসর পরে উক্ত বালটির ২।৩ মাসের অসুখে মৃত্যু হইল—পাছে মৃত্যু সংবাদ শুনিলে, তাঁহার কোন অসুখ বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে মনের কষ্ট মনে চাপিয়া, বাটীস্থ সকলে শোক করিতেন। এদিকে রাজনারায়ণ বাবু অবিনাশকে কয়েক দিন না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন শেষে এমন ব্যাকুল হইলেন যে, বলিলেন "এই খাট শুদ্ধ আমাকে তাহার খাটের কাছে লইয়া যাও" যখন পরিবারস্থ সকলে দেখিল, আর মৃত্যু সংবাদ গোপন করা যায় না, তখন সকলে পরামর্শ করিবা, ডাক্তার বাবু এবং অন্যান্য ভদ্রলোক ও আত্মীয়দিগকে ডাকিয়া একটী বিশেষ আত্মীয়কে উক্ত কথা বলিতে বলিলেন। উক্ত আত্মীয় তখনকার ঘটনার কথা যাহা লিখিয়াছিলেন—তাহা এই—"আজ বেলা ৯টার সময় পরম পূজনীয় রাজনারায়ণ বাবুকে অবিনাশের পরলোক গমনের কথা বলা হইল—এ সংবাদ শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না—উহা শুনিবার পূর্ব্বে তিনি যেমন ধীর ও গম্ভীর ভাবে ভগবানের করুণা ও মানবের সুখ দুঃখ, ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে গভীর তত্ত্ব সকল বলিতেছিলেন এবং বলিতে বলিতে ঈশ্বর প্রেমে বিহ্বল হইয়া, এক একবার হাস্য করিয়া উঠিতেছিলেন ; পরেও ঠিক সেই ভাব রহিয়া গেল। ভাব ও ভাষায় কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে এ ঘটনা হইল" উত্তর হইল আজ ১৬ দিন হইল। বলিলেন, কি আশ্চর্য্য এই আনন্দের সংবাদ কেন শুনাও নাই ? সে'ত্রে মহাশান্তি ধামে গিয়াছে। বলা হইল, মহাশয়ের

শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ, সেই জন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমি শুনান হইল—তিনি হাসিয়া বলিলেন, আজিও আমাকে ইহারা চিনিতে পারিল না সে যত দিন ছিল ততদিন তাহার জন্য খুব ভাবনা চিন্তা ছিল—কিন্তু এখন তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই—সে মহা-শান্তিতে মহা-আরামে রহিয়াছে। তবে কেন আমাকে বলে নাই। আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ইহা আনন্দের বিষয় যে আমি ইহাদের প্রতি কিরূপ স্নেহশীল তাহা ইহারা জানে যোগীন এবং আমার পরিবারস্থ সকলেই খুব ধৈর্য্যশীল—এ ঘটনা তাহারা সকলেই সহ্য করিয়াছে, আমাকে কিছু বুঝিতে দেয় নাই, ইহা বড় আশ্চর্য্য সংসারের এই ত নিয়ম। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ" যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তিনি তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন পরে উক্ত আত্মীয় লিখিতেছেন "এই শোকসংবাদ তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ না দেখিলে লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। তাঁহার সেই প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া সেখানে উপস্থিত সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শুভক্ষণে দেওঘরে আসিয়াছিলাম, শুভক্ষণে আজ রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল আজ জীবনে যে শিক্ষা লাভ হইল, শত গ্রন্থ অধ্যয়নে শত উপদেশে তাহা হয় নাই"

তাঁহার ঈশ্বর-প্রাণতা এমনই গভীর ছিল যে, যখন কেহ ঈশ্বরের দয়া বা জ্ঞানের লাঘবকারী কোন কথা বলিতেন, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইতেন, কখন কখন যেন স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন; তাঁহার হৃদয়ে যে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার মুখমণ্ডলে স্পষ্টই তাহা প্রকাশিত হইত। এক সময়ে তর্ক ও যুক্তি দ্বারা লোকের মনে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রেম উদ্রিক্ত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রণীত "ধর্মতত্ত্ব-দীপিকা", "ধর্ম সাধন" প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। শেষ জীবনে তিনি তর্ক ও যুক্তির প্রতি কিছু বীতরাগ হইয়া

ছিলেন তাই শেষ জীবনে অনেক সময়ে ঈশ্বরের অবমাননাকর কোন কথা শুনিলে প্রায়ই বলিতেন, "ছিঃ অমন কথা বলতে নাই ছিঃ অমন কথা বলতে নাই ." এই মৃদু ভৎসনা বাক্যও ঈশ্বর নিন্দাকারী ব্যক্তির মনে কোন কোন স্থলে বিশেষ ফলদায়ী হইত

শেষ জীবনে গীতার "কেবলাত্মা'' কথাটী তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনা যাইত বলিতেন, "কি ক'রে 'কেবলাত্মা' হতে পারি, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত '' কেবলাত্মা অবস্থার যদি ক্রম স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তিনি উহার উচ্চ ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার মুখে পূর্ণ কেবলাত্মা অবস্থার যে বর্ণনা শুনিতাম, তাহাতে মনে হইত, যেন তিনি সেই অবস্থার পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন অথবা সেই অবস্থার শোভা অতি নিকট হইতেই দর্শন করিতেছেন।

ধর্ম্মপ্রচারকের ভাব তাঁহার হৃদয়কে দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অসমর্থতাপ্রযুক্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া প্রচার কার্য্যে তিনি বিশেষ রূপে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই ইহার জন্য প্রায়ই খেদ করিতেন যখন যেখানে থাকিতেন, কথোপকথন দ্বারা পরিচিত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মনে অতি শান্তভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিতে চেষ্টা করিতেন কাহারও সহিত নূতন পরিচয় হইলে কথোপকথন ব্যতীত ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বপ্রণীত পুস্তক উপহার প্রদান দ্বারা তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী করিবার [illegible] উদ্যোগী হইতেন পরিচিত ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সম্বন্ধেও শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন।

ধর্ম্মপ্রচারকের ভাব তাঁহার মনে কেমন প্রবল রূপে কার্য্য করিত, তাহার পরিচায়ক একটী মাত্র ঘটনা এ স্থলে বলিতেছি। তিনি বৈদ্যনাথে বাসকালে তাঁহার বাটীতে কয়েকজন অতি নিকট পৌত্তলিক-

আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত হয়েন তাঁহারা তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন ; বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া অপরাপর তীর্থে যাইবেন মানস করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ বৈকালে তাঁহাদিগকে সম্মুখে ডাকিয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। নানা তীর্থস্থানের দেবদেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পৌত্তলিকদিগের যেরূপ বিশ্বাস, তাহার উল্লেখ করিয়া তত্তৎ মাহাত্ম্য যে প্রকৃতরূপে জগদীশ্বরেরই, আর কাহারও নহে, তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন এই সকল উপদেশ শুনিয়া আত্মীয়দিগের মনে যে পৌত্তলিকতার প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত পারস্য কবি হাফেজের কবিতা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বাল্যকালে তিনি পারসি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সাদি, হাফেজ, জেলালউদ্দীন রুমি প্রভৃতি পারস্য কবিদিগের ঈশ্বরপ্রেম সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক বচন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইলে তিনি হাফেজ, সাদি প্রভৃতি কবিদিগের বাক্য মুসলমান মৌলবীর ন্যায় অতি বিশুদ্ধ ও মনোহররূপে আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোহরণ করিতেন। একবার হাফেজের শিষ্য পারস্য নিবাসী এক যুবক বৈদ্যনাথে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। ঘটনাক্রমে রাজনারায়ণ বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। হাফেজের শিষ্যবর্গ সুফী নামে অভিহিত হইয়া থাকে সুফী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসাধন প্রণালী, হাফেজের ধর্ম্ম-কাব্য, পারস্য দেশে বর্ত্তমান সময়ে হাফেজ প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে উক্ত সুফী যুবকের সহিত আলাপ করিয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। কয়েক দিন পরে ঐ যুবক বৈদ্যনাথ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাইবার সময় তিনি রাজনারায়ণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান নাই এবং কোথায় যাইবে

করিবেন তাহাও বলেন নাই। ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত বৈদ্যনাথের ভদ্র, অভদ্র কোন মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহাকে ঐ সুফী যুবকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন ধর্ম্মপরায়ণ বা ধর্ম্মোন্মত্ত যুবকের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যাইত। যৌবনকালে হৃদয়ে যে মোহিনী কল্পনা ও কবিত্বময় প্রেম আধিপত্য করে, সেই কল্পনা ও প্রেম লইয়া যে যুবক ঈশ্বরকে হৃদয়স্বামী করিতে পারে, সে অতি ভাগ্যবান এবং সৃষ্টির উদ্যানে অতীব মনোহর কুসুম, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি বলিতেন ঈশ্বর প্রেমিক যুবকের ন্যায় সুন্দর জিনিস আর দ্বিতীয় নাই মানব সমাজের সমুন্নত অবস্থায় প্রত্যেক যুবক যৌবনের সমস্ত কল্পনাময় আবেগ-সহ ঈশ্বর প্রেমিক হইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই জন্যই বোধ হয়, বৃদ্ধাবস্থারও যুবকদিগের সহিত তিনি খুব আগ্রহের সহিত আলাপ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেন, এবং যে সকল বিষয় লইয়া তাহাদিগের সহিত আলোচনা করিতেন, তন্মধ্যে ঈশ্বর প্রেম ও ঈশ্বর-ভক্তি একটী প্রধান বিষয় ছিল। "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ" এই বাক্য তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত।

তিনি চন্দ্রালোক বড় ভাল বাসিতেন নিদান রোগ শয্যায় শয়না-বস্থায় যখন দৃষ্টিশক্তি প্রায় এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তখন এক এক দিন রাত্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আজ কেমন চাঁদ উঠিয়াছে?" চন্দ্রা-লোকের শোভার সংবাদ পাইলেই বারান্দায় লইয়া যাইতে বলিতেন। চন্দ্রালোকের সহিত তাঁহার মনে ঈশ্বর প্রেম উদ্দীপ্ত হইত শরৎকালের পূর্ণিমার রাত্রে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করার প্রথা তিনিই মেদিনীপুরে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। বৈদ্যনাথে থাকিতে কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে সপরিবারে সবান্ধবে কুসুমোদ্যানে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করা তাঁহার

যে কত প্রিয় ও আনন্দদায়ক ছিল তাহা বর্ণনীয় নহে চন্দ্রালোকে বসিয়া সবান্ধবে যখন ব্রহ্ম প্রসঙ্গ বা ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন, তখন বলিতেন "এমন রাত নিদ্রার জন্য হয় নাই,' এবং কখন কখন হিন্দী ভাষায় বলিতেন "আজ তামাম রাত ব্রহ্ম-প্রসঙ্গ হোগা "

পশু পক্ষীর প্রতি তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল। তাহাদের সুখ দুঃখ তিনি বিশেষরূপে বুঝিতেন চিরদিন তাঁহার পোষা কুকুর কি বিড়াল থাকিত। তিনি যখন আহার করিতে আসিতেন, একটী দিনও তাহাদেরে ভুলিতেন না যদি পোষা জন্তুগুলি বাড়ীতে না থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিজে তাদের নাম ধরিয়া ডাকিতেন যতক্ষণ না তাহাদের দেখা পাইতেন, সুস্থির মনে আহার করিতে পারিতেন না। মূক পশুরাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিত একবার একটী সাদা বিড়াল কোথা হইতে বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইল তিনি তাহাকে অতি সমাদরে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং রীতিমত আহার করাইতেন এমন কি নিজে যখন জলখাবার খাইতেন, সে সময় তাহাকে তাহার কিয়দংশ দিতেন। বিড়াল তাঁহার এমন বশ হইয়াছিল যে, কখনও তাঁহাকে ছাড়িত না—যখন আহারের স্থান হইত, তখন আহার সামগ্রী আগলাইয়া বসিয়া থাকিত নিজে কিছুই খাইত না। এক একবার বাহির বাটীতে গিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে সে নিজের ভাষায় অতি প্রেমের সহিত ডাকিত তিনি উক্ত বিড়ালের আওয়াজে বুঝিতেন যে, আহার প্রস্তুত হইয়াছে। বিড়ালটী অনেক দিন থাকিয়া হঠাৎ অদর্শন হইল। রাজনারায়ণ বাবু সে সময় বিড়ালের জন্য এমন উৎকণ্ঠিত হইলেন যে, ঠিক যেন কোন আত্মীয়ের বিরহে তাঁহার ক্লেশ হইতেছে। পরে এক দিন দেখা গেল, বিড়ালটী জীর্ণ শীর্ণ হইয়া বাড়ীতে আসিল। তিনি সংবাদ পাইবা মাত্র উৎফুল্লচিত্তে তাহাকে লইতে আসিয়া তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন।

আপনার কাছে কাছে তাকে রাখিয়া কিসে তার শরীর ভাল হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখিলেন বিড়ালটী তাঁহার কাছে কাছে রহিল, ■ দিন পর্য্যন্ত সে কিছু আহার করিল না, কেবল স্থির দৃষ্টিতে তাহার প্রভুর দিকে তাকাইয়া থাকিত এইরূপ অবস্থায় একদিন তাহার মৃত্যু লক্ষণ দেখা গেল। রাজনারায়ণ বাবু সে সময় অতি মাত্র ব্যস্ত হইয়া তাহার কতই সেবা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে বিড়ালটী প্রভুর দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল যতবার রাজনারায়ণ বাবু তাহার নাম ধরিয়া ডাকেন, তত বারই তার ভাষায় উত্তর দেয়। এইরূপ করিয়া তার মৃত্যু হইল তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন, এমন ভাল বিড়াল তবু দেখ, পশুপ্রকৃতি তার যায় নাই—কত খাবার সামগ্রী সে নিজেই রক্ষা করিয়াছে—হঠাৎ কি তাহার দুর্ম্মতি হইল, সে কার বাড়ী গিয়া চুরী করিয়া খাইয়াছিল, তাই তারা এমন মারিয়াছিল যে, তাহাতে তার মৃত্যু হইল।

দেওঘরে একটী কুকুর তাঁর খুব প্রিয় ছিল সে কুকুরটীর নাম রাখিয়াছিলেন চারু রাজনারায়ণ বাবুকে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রায়ই আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন। তখন কুকুরটী সঙ্গে যাইত একদিন বাড়ীতে সকলে বলিল, "কুকুরটা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বাড়ীতে সমস্ত রাত্রি থাকে, এ বাড়ীতে আর পাহারা দেয় না আজ আর ও নিমন্ত্রণে যাইতে পারিবে না।" তিনি তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। পরে ঐ কুকুর পাগলা হইয়া গেল, মাজিষ্ট্রেট সাহেব গুলি করিয়া মারিতে চাহিলেন, রাজনারায়ণ বাবু একটা ঘরে কুকুরকে রাখিয়া বলিলেন, "ওকে শান্তির সহিত স্বাভাবিক ভাবে মরিতে দেও।"

প্রত্যেক দিন আহার সমাপ্ত হইলে কিছু ভাত এবং পাতের

তলায় যাহা পড়িত তাহা একত্র করিয়া কাকদের দিতেন, অনেক কাক ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া তাহা খাইত তিনি দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন তিনি বলিতেন পঞ্চযজ্ঞ প্রত্যহ করিতে হয়—ইহাই পশুযজ্ঞ

একদিন চাকরদেরে কে যেন বলিতেছিল, "বসে বসে পয়সা খাবি ?" পক্ষাঘাত অবস্থায় রাজনারায়ণ বাবুর তখন উত্থান শক্তি রহিত। তিনি উহা শুনিয়া বলিলেন, "ঠিক, ঈশ্বর আমাদের বলিতেছেন 'বসে বসে পয়সা খাবে ?'"—যিনি বলিয়াছিলেন তিনি বলিলেন "তবে কি করিব ?" উত্তর "কর্ত্তব্য কাজ কর" "কর্ত্তব্য বুঝিব কি করে," তিনি নিজের বুক দেখাইয়া বলিলেন, এর ভিতর একজন আছেন—"তিনি কেবল বলিতেছেন, অন্যায় করোনা, অন্যায় করোনা"

একবার তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের সাংঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া বাটীস্থ সকলে কাঁদিতেছিল তিনি গম্ভীর ভাবে সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও, পৃথিবীতে শোক তাপ দুঃখ বিপদ দরিদ্রতা সব আমাদের আশে পাশে ঘুরিতেছে। এসব সহিবার জন্য প্রস্তুত থাক। প্রস্তুত থাকাই আমাদের ধর্ম্ম, অধীর হওয়াত আমাদের ধর্ম্ম নয়"

যখন পক্ষাঘাত রোগ হয়, তখন তিনি হাফেজের এক কবিতা আবৃত্তি করিয়া শয্যাশায়ী হয়েন, তাহার ভাব এই "অনিত্য পৃথিবী, হে প্রিয়তম তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"

ইদানীং পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হইয়াও পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তক কাহাকেও না কাহাকে পাঠ করিতেবলিতেন—প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কিছু ক্ষণ ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেন ও ভগবদ্গীতার ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্লোক নিজেই আবৃত্তি করিতেন প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা করিতেন, সে সময় তাঁহার

মুখে কি যে স্বর্গীয় উজ্জ্বল ভাব হইত, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখনও ভুলিবেন না।

সামান্য দ্রব্যও তিনি ফেলিয়া দিতেন না মসলা বাঁধা দড়ী এবং দেশলাইয়ের জ্বালান কাঠিগুলি পর্য্যন্ত রাখিতেন, একদিন কেহ বলিলেন "সামান্য দ্রব্যে এত মায়া কেন?"—তিনি বলিলেন, "মনে কর রাত দুপ্রহরের সময় কাহাকেও সাপে কামড়াইল তখন তাড়াতাড়িতে দড়ী পাওয়া যাইতেছে না, তখন এই দড়ীগুলি পাইলে একজনের জীবন বাঁচিতে পারে আর দেশলাইয়ের কাঠিতে প্রদীপ উস্কাইতে বিশেষ দরকার।" কোন জিনিস যদি বাহিরে পড়িয়া থাকিত তিনি সে গুলি ঘরে আনিয়া রাখিতেন বলিতেন "গুছাইয়া রাখ"

অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ব্রহ্মসঙ্গীত শুনাইতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। এজন্য তাঁহার দৌহিত্রীদের সঙ্গে লইয়া কখন কখন তাঁদের বাড়ী যাইয়া গান শুনাইয়া আসিতেন একবার তিনি তাঁদের বাড়ী যাবেন এমন সময় কেহ বলিল "আপনার ফটো তুলিব" তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "নিকৃষ্ট আমোদের জন্য ধর্ম্ম প্রচারের এমন সুযোগ তোমরা হারাইতে চাও?"

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে এত ভাল বাসিতেন ও তাহাতে এত বিভোর হইতেন যে, ঠিক যেন "গানময় দেশে, দূর সুর শেষে বিলীন হইয়া রহিবে" এইরূপ অবস্থা তাঁহার হইত। কি ব্রহ্মসঙ্গীত, কি উচ্চ ভাবের জাতীয় সঙ্গীত, সকলই তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। ব্রহ্ম সঙ্গীতই সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিতেন, ভাবে গদগদ হইতেন। যখনই কোন গায়ক দেওঘরে যাইতেন, সংবাদ পাইলে তাঁহাকে বাড়ীতে আনাইতেন। এমন তন্ময়চিত্তে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতেন যে, আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইতেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেন, আমার ইচ্ছা

করে সমস্ত রাত্রিই এই ভাবে কেটে যাক না—আমার কোন কষ্ট হবে না পরমানন্দে কেটে যাবে কিন্তু তোমাদের পাছে কষ্ট হয়, এই আমার ভাবনা—তাই বন্ধ করিতে বলিতেছি এত যে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তবু জাতীয় ভাবে পূর্ণ থাকিতেন কেহ যদি জাতীয় সঙ্গীত করিত, অমনি তাঁহার বদনে যুবার ন্যায় তেজ ও শৌর্য্য দেখা যাইত একবার লাহোরে কংগ্রেস হইতেছে, সেই সময় তাঁহার দৌহিত্রী গাহিতেছিল, 'পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'' তিনি শুনিতে পাইয়া বলিলেন "ও গান গাস্‌নে—সব কথা মনে হয়, শরীর দিয়ে আগুন বাহির হয়—মন 'উদ্‌ভ্রান্ত' হইয়া যায় গাস্‌নে গাস্‌নে ''

গীত বাদ্য হইতেছে, কখন কখন সঙ্গীত বন্ধ করিয়া, কেবল বাজনায় ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে বলিতেন বেহালা, এস্রাজ, হারমোনিয়মে কেবল সুরেতেই ব্রহ্মসঙ্গীত হইত। শুনিয়া এমন মুগ্ধ হইতেন এবং বলিতেন "কি মধুর কি মধুর, শুধু সুর তান লয়ে তাঁহার নাম কি মধুর "

তিনি নারীদিগের ব্রহ্ম সঙ্গীত গাওয়া খুব ভাল বাসিতেন তাঁহার দৌহিত্রদের অপেক্ষা দৌহিত্রীদের ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন তখন তিনি এমন আত্মহারা হইতেন যে, অনেক সময় তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না। বাহ্য লক্ষণে ভাবের উচ্ছ্বাস কিছুই বুঝা যাইত না, কিন্তু তাঁহার গম্ভীর লক্ষণ দেখিয়া নিতান্ত কঠোর প্রাণও বিগলিত হইয়া যাইত। তাঁহার দৌহিত্রীরা একবার হিন্দি সঙ্গীত গাহিতেছিল, "রা হিম না জুদা কর, দিলকা সাচ্চা করজি'' তিনি শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলি ন "সচ্‌ বাত হ্যায়, সচ্‌ বাত হ্যায়।''

"ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম'', "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'', "পদপ্রান্তে রাখ সেবকে'', "কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে" "সে কোন্

জোছনা দেশ", "প্রথম নাম ওঁকার", "সেই অপরূপ সংস্বরূপ", 'মিটিল সব ক্ষুধা" ইত্যাদি সঙ্গীত তাঁহার খুব প্রিয় ছিল

তাঁহার বাটীতে কোজাগর পূর্ণিমাতে বিশেষ উপাসনা ও উৎসব হইত একবার উক্ত পূর্ণিমায় কি কি গান হইবে সব ঠিক করা হইল ঠিক করিতে করিতে—গান প্রায় ১৫ ১৬টি হইয়া পড়িল আমি বলিলাম, "অনেক যে হইয়া গেল", তিনি বলিলেন "যা লইতেছি তাই যে মধুর, তাই সুন্দর, এমন মধুর যে ত্যাগ করিতে মন কেমন করে—করি কি বল।" তার পরে সে দিন সে সমস্ত গানই হইল

চারিটী ব্রহ্ম সঙ্গীত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাহা গাইতে হইবে ; "ঐ যে দেখা যায়" "তোমারি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন" "আজ আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহারো " আর "তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ "

গত বৈশাখ মাসে যখন আমরা সেখানে ছিলাম , সন্ধ্যার সময় যখন সঙ্গীত করিতে বলিতেন, তখন ঠিক করিয়াছিলেন যে সব শেষে হইবে "মিটিল সব ক্ষুধা তাঁহার প্রেমসুধা চলরে ঘরে লয়ে যাই" আহা, তাঁহার ঈশ্বর প্রেমের ক্ষুধা মিটিয়াছিল—সত্যই তাঁহার প্রেম সুধা লইয়া ঘরে গেলেন

মৃত্যুকালে দেখিলাম, মহাপুরুষ বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া যেন কাহার আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া, গম্ভীর সৌম্য মূর্ত্তিতে রোগ-শয্যায় শয়ান আছেন সাড়া নাই, শব্দ নাই, কোন কষ্ট যন্ত্রণা নাই, যেন বাহিরের সব কোলাহল হইতে হৃদয়কে আনন্দে ডুবাইয়া, কি এক অমূল্য রত্ন পাইয়া মহা আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। ঠিক যেন "মহা যোগীর মহা ভাব" একি মৃত্যু না যোগ ?

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পারিবারিক উপাসনার প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরম মাতা পরমেশ্বর ? আমরা পিতা পুত্রে ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পুরঃসর তোমার পূজা করিতেছি তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তুমি আমাদের গৃহ দেবতা; তোমাকে ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকে জানি না, তুমি আমাদিগের প্রতি করুণা কর। তুমি এই পরিবারকে তোমার মঙ্গলচ্ছায়া প্রদান কর এই পরিবার মধ্যে যেন কখন বিরোধ ও কলহ উপস্থিত না হয়; যদি আমরা সম্পদে উত্থিত হই, তবে সেই সম্পদে মত্ত হইয়া তোমাকে যেন বিস্মৃত না হই ? যদি আমরা বিপদে পতিত হই, সে বিপদের মধ্যে তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন অটল ভাবে অবস্থিতি করি তোমার ধর্ম্মবলে বলীয়ান কর, তোমার নিকটে আমাদের আর অন্য প্রার্থনা নাই।

ওঁ শান্তি শান্তি।

কলিকাতা,

৬নং কলেজ স্কোয়ার, সাম্যযন্ত্রে শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

মূল্য /০ এক আনা।